দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌণ লেখকদের রচনা পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌণ লেখকদের রচনা পরিচয়

আমাদের আলোচনার সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৯৫০ - ৫৫) পর্যন্ত । এই নির্দিষ্ট কাল নির্বাচনের কারণ হিসেবে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষিত বাঙালীরা কর্মোপলক্ষে বা ভাগ্যান্বেষণে বিহারে (অন্যান্য প্রদেশে ও) গমনাগমন শুরু করেন । দ্বিতীয়তঃ এর পূর্ববর্তী সময়ে ঐ অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় । ঐ সময়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য তারুণ্যে পা দিয়েছে । আবার ঐ কালসীমার পরবর্তী কালেও বিহার প্রবাসী লেখকদের ভূমিকা নগণ্য । তা ছাড়া গবেষণার ক্ষেত্রে একটা কালগত দূরত্ব বাঞ্ছনীয় । এই সময় প্রবাসী সাহিত্যিকদের সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নয় । সীমিত আলোচনার প্রয়াসে কেবল বিহার - প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের নির্বাচন করা হয়েছে । পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, সাহিত্যিকদের মধ্যে ঔপন্যাসিকগণ - আবার সেইসব ঔপন্যাসিক-গণের উপন্যাস, যাঁদের রচনায় বিহারের মানুষ, পরিবেশ ও চালচিত্র মুখ্যস্থান অধিকার করেছে । সে কারণে অনেকের সাহিত্যকৃতি আলোচনার সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে হয়েছে । সাধ থাকলেও সাধ্য নেই । নিজের এই ত্রুটি স্খালনের উপায় হিসেবে সেইসব ঔপন্যাসিকগণের উপন্যাসের আংশিক আলোচনা এই অধ্যায়ে করতে চাই - যাঁদের উপন্যাসে বিহারের চালচিত্র এবং মানুষ গৌণ ভূমিকা পালন করেছে । তাঁদের আলোচনা সূচনাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি ।

– তাঁরাই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, আমার আলোচনায় মুখ্য গৌণ বিচার সাহিত্যিক হিসেবে নয় - উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বিহারের

উপস্থিতির মুখ্যতা - গৌণতা হিসেবে । এঁদের মধ্যে অনেকেই অগ্রগণ্য সাহিত্যিক, কিন্তু আমাদের গবেষণার পক্ষে গৌণ যেহেতু বিহারের সমাজ বা প্রকৃতি তাঁদের রচনায় গৌণ ভূমিকা নিয়েছে ।

সর্বাগ্রে বিহার প্রবাসী ঔপন্যাসিকদের নিম্নলিখিত কালানুক্রমিক তালিকাটি অনুধাবন করা যেতে পারে —

(১) শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়	(১৮৪৭ - ১৯১১)
(২) '' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৮৪৯ - ১৯১১)
(৩) '' দীনেশচরণ বসু	(১৮৫১ - ১৮৯৮)
(৪) '' শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	(১৮৬০ - ১৯০৮)
(৫) '' নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	(১৮৬১ - ১৯৪০)
(৬) '' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৮৬৩ - ১৯৪১)
(৭) '' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৮৬৬ - ১৯২৩)
(৮) '' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	(১৮৭৩ - ১৯৩২)
(৯) '' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	(১৮৭৬ - ১৯৩৮)
(১০) '' বিভূতিভূষণ ভট্ট	(১৮৮১ - ?)
(১১) '' অনুরূপা দেবী	(১৮৮২ - ১৯৫৮)
(১২) '' নিরুপমা দেবী	(১৮৮৩ - ১৯৫১)
(১৩) '' উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	(১৮৮৩ - ১৯৬০)
(১৪) '' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	(১৮৮৪ - ১৯৬৬)
(১৫) '' ইন্দিরা দেবী	(১৮৮৯ - ১৯২২)
(১৬) '' মানিক ভট্টাচার্য্য	(১৮৮৯ - ১৯৬৫)
(১৭) '' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৮৯৪ - ১৯৫০)
(১৮) '' বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	(১৮৯৪ - ১৯৮৭)
(১৯) '' বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	(১৮৯৯ - ১৯৭৯)

(২০) শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯ - ১৯৭০)
(২১) '' সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬ - ১৯৬৫)
(২২) '' সুবোধ ঘোষ (১৯০৬ - ১৯৮০)
(২৩) '' আশালতা সিংহ (১৯১১ - ১৯৮৩)
(২৪) '' বিমল কর (১৯২১ -)

ওপরের তালিকাভুক্ত লেখক লেখিকাদের অনেকেই বিহারের দু/একটা স্থানের নাম বা খোটা দারোয়ানের উল্লেখ ছাড়া ঐ বিশাল দেশের কিছুই উপন্যাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন নি। তাঁরা বিহার প্রবাসী ঔপন্যাসিক হয়েও আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নন। যেমন — শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচরণ বসু ইত্যাদি।

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাঙাল নিধিরাম', 'ফোকলা দিগম্বর', 'পাপের পরিণাম', 'যমুনা কোথায়' এবং 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস পাঁচটি পাঠ করার পর বলা যায় তিনি বিহারে বাস করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মে বিহারের চালচিত্র অনুপস্থিত। বিহারে বসবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনাকে আদৌ প্রাণিত করেনি।

শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'কল্পতরু'য় কলকাতার এক ব্রাহ্ম-যুবকের কাহিনী অবলম্বনে তৎকালীন কলকাতা ও গ্রামবাংলার কিছু সামাজিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। দীনেশচরণ বসু রচিত 'কুল কলঙ্কিনী', 'মোহিনী প্রতিমা' বা 'সরলা', 'নিরাশপ্রণয়', 'বিমাতা না রাক্ষসী' প্রভৃতি উপন্যাসেও বিহার - বিষয়ক কিছু উত্থাপিত হয়নি।

শ্রী গ্রীশ চন্দ্র মজুমদার, শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে প্রথম দিকের লোক - তখন বিহারে বাঙলা সাহিত্যচর্চার প্রাথমিক অবস্থা - সেই অবস্থায় এঁদের অবদানের মূল্যায়ন পরবর্তীদের সঙ্গে একই মানদণ্ডে বিচার করলে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। তবু উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বিহারের

প্রকৃতি, মানুষ, রীতিনীতি ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথের স্থান মুখ্যদের মধ্যেই রাখা হয়েছে ।

১৩২৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ৭৩ বৎসর পূর্বে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাধের বৌ' উপন্যাস ''ভাগলপুরের অক্ষয়কীর্ত্তি'' ১। - '' পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন । তিনি ঐ উপন্যাসের মুখবন্ধে প্রকাশ করেছেন যে 'সাধের বৌ' উপন্যাসের ''কুশীলবগণের অনেকে সজীব সাধারণ নরনারী, আমাকে কল্পনার খেলা বেশী খেলিতে হইতেছে না ।''- ২। মুখ্য চরিত্র পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের বরারী উপনগরে বাস করতেন । তিনি ভাগলপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । ত্রিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হবার পর থেকে সন্ন্যাসী - জীবন যাপন করেন । আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠাতা ' দয়ানন্দ স্বামী সরস্বতী প্রায়ই তাঁর অতিথি হতেন । অঘোরী বাবা নামধেয় মহাপুরুষও তখনকার জীবিত ব্যক্তি । এতকথা বলার উদ্দেশ্য 'সাধের বৌ' উপন্যাসের নরনারীগণ বিহারের বাস্তবচরিত্র । কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমার আলোচ্য - তালিকাভুক্ত হয়নি - কারণ কয়েকটি চরিত্র যারা বিহারবাসী বলে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র এবং দু/একটা কথা বা আচরণে বিহারী - ভাব । আমার আলোচনায় এটুকু যথেষ্ট নয় । উপন্যাসের বর্ণনা থেকে এ - কথা বুঝবার উপায় নেই যে উপন্যাসের ঘটনাবলী বিহারের পটভূমিকায় ঘটছে ।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের তিন/চারটি উপন্যাসের মধ্যে 'শক্তি-কাননে'ই বিহারের প্রাকৃতিক পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে । 'শক্তি-কানন' উপন্যাসে বিহারের রাজমহল পাহাড় অঞ্চলের নৈসর্গিক বর্ণনা শ্রী মজুমদার বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন - উপন্যাসে কাব্যপাঠের আনন্দ অনুভূত হয় । দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ——

> রাজমহল অঞ্চলে বিস্তৃত শালবন । দক্ষিণদিকে শ্যামল শৈলশ্রেণীর প্রাচীর, যেন বিশুষ্ক মৃৎসিন্ধুর শ্যাম তরঙ্গরাজি । উত্তরে ভাগীরথী প্রবাহিতা । - ৩।

কার্ত্তিক মাসের পাহাড়ী স্রোতস্বিনী অপেক্ষাকৃত ধীরগতি — পাহাড়ঘেরা শালবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঘুরে ঘুরে এসে ভাগীরথীতে পড়েছে — মনে হচ্ছে যেন কোন অজগর-শিশু অগ্রসর হচ্ছে । '' সেই শৈল তলে শাল বনের ভিতর অন্যতর

শান্তি-কানন ।'' - ৪।

পাহাড়ী ঝরণার ঝংকার ও পাখীর কলকাকলিতে পূর্ণ শৈলসানুদেশে কানন —— কাননে মন্দির —— মন্দিরপ্রাঙ্গণে শিউলিফুলের ছড়াছড়ি —— পুষ্পসৌরভে চতুর্দিক আমোদিত । —— দূরে তিনখানি মাটির কুটীর । বাংলার বাইরের এমন এক শান্ত সুন্দর পরিবেশকে লেখক আর এক জায়গায় তুলে ধরেছেন ——

> রাজমহলের সুন্দর শৈলশ্রেণীর অপরপারে একবার যাই । চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় বেড়া ক্ষুদ্র উপত্যকাভূমি । সেখানে শালগাছের এমন বাহুল্য নাই — তবে বৃক্ষরাজির অভাবও নাই । অধিকাংশই মহুয়া এবং অন্যান্য বন্যবৃক্ষ । আর একটা বৃহত্তর নির্ঝর । কাছেই একটা ছোটখাট প্রখর নদী শৈল সানুতল প্রক্ষালন করিয়া একটু বেশী হাঁকে ডাকে নীচে গিয়া পড়িতেছিল । বাতময়ী প্রতিধ্বনির বিরাম বিশ্রাম নাই । - ৫ ।

এই পুস্তকে গয়াধামের ঝংকালং তীর্থের সরস বর্ণনা আছে -

> গয়াধামে ঝংকালং তীর্থ বড় সুন্দর স্থান । বৃহৎ জলপ্রপাতের যে সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য, তাহার উপর স্থান মহিমায় ইহাতে একটা অনৈসর্গিক ভাব, একটা পবিত্রতা জড়িত আছে । মরুবৎ প্রান্তর সব, নদনদী সব প্রায় বারমাস শুষ্ক বালুকা রাশি হৃদয়ে ধারণ করে, কি জানি কাহার ভয়ে যেন সলিল কণা মাত্র অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে, কূপের নিভৃতে সন্ধান না করিলে আর তাহার দর্শন পাওয়া যায় না । এমনস্থলে পাহাড়ের প্রস্তর হৃদয়ভেদ করিয়া কোথা হইতে শত শত হস্তদূর ব্যবধানে এই স্বাদু নীরধারা উছলিয়া পড়িতেছে ? তুমি সুজলা সুফলার সন্তান, এই বারিশূন্য স্থানের এ তীর্থমহিমা দূর হইতে তোমার মর্ম্মস্পর্শ করিতে না পারে, কিন্তু একবার ঐ শৈলপাদমূলে আসিয়া দাঁড়াও, স্থানমহিমা তোমায় বিস্মিত বিমুগ্ধ করিবে । বাস্তবিক বড় সুন্দর স্থান । লহরে লহরে স্ফটিকবৎ সলিলরাশি অবিরাম শত শত হস্ত নীচে পরিখায় সঞ্চিত সলিলে আসিয়া মিশিতেছে, স্তূপে স্তূপে ফেনপুঞ্জ সৃষ্টি হইতেছে —— সেই বারিধারা আর প্রত্যেক ফেন বুদবুদে সর্ব্বত্র ইন্দ্রধনুর

111476 28 SEP 1994

মেলা । .....

সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলী প্রতি বৎসর এ তীর্থ দর্শনে আসিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া যায়, ইহার সলিলে স্নাত হইয়া পাপ ক্ষয় করে । কিন্তু এখানে কেহ রাত্রি যাপন করে না । জনশ্রুতি এই যে আজিও কোন কোন যোগী ঋষি মধ্যে মধ্যে আসিয়া এখানে তপস্যা করিয়া থাকেন । পরিখার ঠিক উপরে দুরারোহ শৈলশিখরে একটি অতি প্রাচীন শিবালয় আছে । সে স্থান সচরাচর অধিগম্য নহে । - ৬।

ওপরের বর্ণনা বাস্তব -অভিজ্ঞতা প্রসূত । কিন্তু কোন উপন্যাসে একটা নির্দিষ্ট স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা বা স্থান মাহাত্ম্যের কথা বিহারে বাস না করলেও লেখা সম্ভব । অল্পদিনের জন্য বেড়াতে গেলেও কোন জায়গার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দেওয়া যায় । বৃহত্তর বিহারের মানুষ, সমাজ, নিসর্গ বাদ দিয়ে শুধু দুটো/একটা জায়গার বর্ণনা বিহারকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার বলে গণ্য হবে না । এই যুক্তিতে শ্রীশ মজুমদারের উপন্যাস আমার আলোচনার অঙ্গীভূত হয় নি ।

এঁদের পরই বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ভাগলপুরগোষ্ঠীর লেখকরা । এই গোষ্ঠীর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় - প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত উপন্যাসিক । শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব), গৃহদাহ প্রভৃতি দু/চারটে উপন্যাসে বিহারের ভাগলপুরের কোন কোন স্থানের কথা আছে যে স্থানগুলো এখনও সেই স্ব সাক্ষ্য বহন করে বর্তমান । কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের ''ইন্দ্রনাথ'' ।

বিভূতিভূষণ ভট্ট রচিত তিনটি উপন্যাস - 'স্বেচ্ছাচারী', 'আশা', 'মহুয়া' । অল্পশিক্ষিত বিহারীদের প্রায় সকলের বৈশিষ্ট্য তুলসীদাসের রামায়ণপাঠ । 'মহুয়া' উপন্যাসে লেখক এই বক্তব্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

বিহারী সন্ন্যাসীর মুখে তিনি হিন্দী ভাষা ব্যবহার করেছেন। চরিত্রোপযোগী নির্ভুল আঞ্চলিক হিন্দীভাষার যথাযথ প্রয়োগ, তাঁর বিহার-বাসের সাক্ষ্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। 'স্বেচ্ছাচারী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু, নায়কনায়িকা এবং পরিবেশ সবই গ্রাম বাংলার এবং কলকাতার। কিন্তু 'আশা' উপন্যাসের স্থানিক রঙ কিছুটা বিহারের। যেমন 'সম্বলপুরের' কথা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে — সম্বলপুর বিহারের একটি জায়গার একটি গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

> কয়েকঘর আধবাঙালী পৌনে খোট্টা গোছের গৃহস্থের খোলার চাল, ধূলা-কাদায় ভরা একটি মেটে রাস্তা আর ছুঁচমুখীর বেড়ায় ঘেরা টোকো আমের বাগান।'' - ৭।

উপন্যাসের 'বিষ্ণু' এবং 'হরি'র কথোপকথনে জানা যায় তারা বাঙালী — আর দেশোয়ালী লোকরা ''হিন্দুস্থানী সাঁওতাল''। গ্রামখানির প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও লেখক আলোকপাত করেছেন —

> অদূরে গ্রামের উত্তর ও পশ্চিম ঘিরিয়া গিরিশ্রেণী। সেই গিরিশ্রেণীর তল-দেশ বেড়িয়া বেড়িয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিমায় একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছে। উপত্যকা আর অধিত্যকার উত্থান পতনের মধ্যে শ্যামল শস্যের বিস্তীর্ণ আস্তরণের উপর দর্শকের মন অতি সহজেই ছুটিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ করিয়া ফেলে। দূরস্থ পর্বতগাত্রও ঘন শালবনে শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। - ৮।

চরিত্রগুলোও তদ্দেশীয় — যেমন রামভজন সিং, দাসীকন্যা মনিয়া, নায়েব রামরাও মিশির, চৌকিদার গরবরণ সিং, কোটাল কেশব ভকত, নায়েব কন্যা জানকি, রঘুয়া, গোয়ান-চালক মনু পাড়ে ইত্যাদি। সবকিছুর স্পর্শ থেকেও বিহারের লোকজীবন বা প্রকৃতি মুখ্য হয়ে ওঠে নি।

অনুরূপা দেবী অনেক উপন্যাস লিখেছেন। যথা - 'মা', 'জ্যোতিঃহারা',

'পথহারা', 'ত্রিবেণী', 'পথের সাথী', 'রামগড়', 'চক্র', 'পূর্বাপর', 'বাগদত্তা', 'উল্কা', 'সাতঙ্গী', 'মন্ত্রশক্তি', 'হার', 'সোনার খনি', 'পোষ্যপুত্র', 'প্রাণের পরশ', 'মহানিশা', 'হারানো খাতা' ইত্যাদি। উপরোক্ত উপন্যাসগুলোর অধিকাংশের কুশীলব বিহারের নয়। 'জ্যোতিঃহারা' উপন্যাসে গল্পের প্রথমে গঞ্জিকাসেবী কৃষ্ণবর্ণ বিশালকায় এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর কথা আছে। 'মহানিশা' উপন্যাসে 'বেহারীদা' একটি বিহারী চরিত্র। অনেক উপন্যাসেই বিহারের কোন কোন স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উল্লেখসহ বর্ণনা অল্পস্বল্প আছে। 'ত্রিবেণী' এবং 'রামগড়' ঐতিহাসিক উপন্যাস — পুরাকালের গৌড়-মগধ-পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনী ত্রিবেণীতে বর্ণিত হয়েছে। 'রামগড়' উপন্যাসেও প্রাচীন বিহারের কথাই পাওয়া যায়। অথচ, আমাদের গবেষণার বিষয়, প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের সাহিত্যে পটভূমি হিসেবে আধুনিক বিহারের উপস্থাপনা - ঐতিহাসিক বিহার নয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করে রাখা উচিত মনে করি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার', 'কালের মন্দিরা', 'কুমার সম্ভবের কবি' আমাদের তালিকাভুক্ত হয় নি একই কারণে। 'গৌড়মল্লার' ঐতিহাসিক উপন্যাস — সুদূর অতীতের বিহারের উপাখ্যান নিয়ে এ উপন্যাস রচিত। অনুরূপা দেবীর অনেক উপন্যাসে বহু চরিত্রের মুখে হিন্দীভাষা দেখা যায় — এর দু/চারটে উদাহরণ পঞ্চম অধ্যায়ে ('ভাষা' আলোচনার সময়) লিপিবদ্ধ করা হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'চক্র' উপন্যাসে পরেশনাথ পাহাড়ের কথা উল্লেখ করা যায়। 'সাতঙ্গী' উপন্যাসে সাতঙ্গীর বর্ণনা আছে। 'সাতঙ্গী' একটি বৃহৎ জলাশয়। কিন্তু বড় সুন্দর — এপার থেকে ওপার স্পষ্ট দেখা যায় না — চারিপাশ পুষ্পশোভিত — সব মিলে নয়নাভিরাম — 'সাতঙ্গী' পীরের পাহাড়ে অবস্থিত। 'উল্কা' উপন্যাসের ঘটনাস্থল বাঁকিপুর। এই ছোট্ট উপন্যাসে বিহারের দেশোয়ালী পরিবেশ সুচিত্রিত; গ্রাম্য লৌকিক সঙ্গীত এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। তবে এইসব নৈসর্গিক বর্ণনা অভিজ্ঞতার উপাদানে উপন্যাসের অলংকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিহারবাসী সাহিত্যিকদের সাহিত্যে দারবান্, ভৃত্য, ড্রাইভার, গোয়ালা সকলেই বিহারী — এটা বিহারবাসের প্রত্যক্ষ ফল — এই সব চরিত্র রূপায়ণ প্রায় সর্বত্রই সঠিক দেখা যায়। বিহারে তখনো ইংরাজি - শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠে নি। তাই নিম্নবিত্ত বিহারীদের সংস্পর্শেই তখন মধ্যবিত্ত বাঙালি আসতেন। তাঁদের কথাই উপন্যাসে প্রসঙ্গত লেখকেরা বর্ণনা করেছেন। বাস্তব -অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই উক্ত চরিত্রগুলো সজীব। অনুরূপা দেবীর উপন্যাস সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু মূল বিষয় বা চরিত্র কোনটিতেই বিহার মুখ্য হয়ে ওঠেনি।

ভাগলপুরগোষ্ঠীর আর একজন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থল বিহারের বনজঙ্গলপূর্ণ তিরোবিয়া গ্রাম। ডাকাতির তল্লাস উপলক্ষে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অরণ্যপরিবৃত পথ, পথচারী এবং ঐ সব গ্রামবাসীদের যে পরিচয় এই গ্রন্থে রেখেছেন নিবিড় পরিচয় ব্যাতিরেকে এ বর্ণনা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ———

> বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গালুডি ষ্টেশনের মাইল দশেক দক্ষিণপশ্চিমে একটি বৃহৎ শালবনের প্রান্তদেশে তিরোবিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র গন্ডগ্রাম আছে। গ্রামের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর অধিবাসীর মধ্যে ঘর পাঁচেক মুসলমান ও দুই ঘর হিন্দু গোয়ালা ভিন্ন বাকী সমস্তই কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি। চক্র-ধরপুরের লাক্ষা সংগ্রহ ও সিংভূমের অভ্র ও লোহার খনিতে কুলিগিরি ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্যে এরা মাঝে মাঝে যে দু - চার রকমের উপায়ান্তর অবলম্বন ক'রে থাকে তার একটি নমুনা পীরনগর থেকে ঝাড়গ্রামের পথে সন্ধ্যাহরণের দিন দেখা গেছে। .... পুলিশের দুরতিক্রম অন্বেষণ থেকে মাল ও মানুষকে নিরাপদে রাখবার জন্য সুদূরবাসী সহধর্মীদের সহ - যোগিতার প্রয়োজনও তাদের কম নয়। - ১।

উপন্যাসের নায়িকা একমাসের বেশী সময় ঐ তিরোবিয়া গ্রামের এক মুসলমান - বাড়ীতে অবরুদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে সন্ধ্যাকে 'বালুডি' পাহাড়ে নিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করে রঘুগোয়ালা। বালুডিতে রাখার নিরাপত্তা সম্পর্কে সে মন্তব্য করছে —

> পুলিশের তল্লাস জুড়িয়ে গেলে তারপর তাকে বালুচির পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেখানে পুলিশ তো পুলিশ, চন্দোর-সূর্যি সেঁদোবার উপায় নেই''। - ১০।

এ ছাড়া জামসেদপুরের বাঙালীদের আলোচনায় প্রবাসী বাঙালী সমাজের কিছু পরিচয় মেলে। পাল্কীবাহকদের কথোপকথনের ভাষা হিন্দী এবং তাব প্রয়োগ সুষ্ঠু। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্তরাগ' উপন্যাসে বিহারের বিভিন্ন স্থানের কথা ঐ স্থানের মানুষ এবং প্রকৃতিসহ বিধৃত হয়েছে। তিনি ডুমরিয়া রেলস্টেশনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা যেমন বর্ণনা করেছেন, পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত গো-মহিষের চারণক্ষেত্রের কথাও তুলে ধরেছেন তার সমস্ত বহিরঙ্গসহ - তাঁর এই নিষ্ঠার জন্য বিহারের কোন প্রত্যন্ত গ্রামের ছবি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়। উদ্ধৃতি অনুসরণে ——

> দূরে ডিগরিয়া পাহাড়ের তলদেশে গোচরভূমিতে গোমহিষের দল চরিয়া বেড়াইতেছিল —— তাহাদের কণ্ঠলগ্ন ঘন্টার বিচিত্র ঢং ঢং ধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। - ১১।

বিহারের একটি আদি ও অকৃত্রিম চিত্র। অপর সমস্ত উপন্যাসের যথা 'অমলা', 'যৌতুক', 'বিদুষীভার্যা', 'রাজপথ', 'মায়াবতীপথে', 'শশিনাথ', 'একই বৃন্ত', 'রাজভাগ', 'অমূলতরু', প্রভৃতির পটভূমি বিহার নয়। 'মায়াবতীপথে' গ্রন্থে পথের বর্ণনায় ভীমতাল ও ভাগলপুরের উল্লেখ আছে।

নিরুপমা দেবী, ইন্দিরা দেবী এবং সৌরীন্দ্র মোহন— এঁদের উপ-ন্যাসেও বিহারের চালচিত্র অনুপস্থিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ভাগলপুর গোষ্ঠীর সাহিত্যিকগণ বিহারপ্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেও এঁদের রচনায় বিহারের মানস-জীবনের এবং জনজীবনের স্থান মুখ্য নয়। এঁরা মনেপ্রাণে, বাঙালীই থেকে গেছেন। বিহার এঁদের সাহিত্যচর্চায় বিশেষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বিহারের মানুষ এঁদের উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেনি।

বিহারবাসী সাহিত্যিকদের সাহিত্যে দ্বারবান, ভৃত্য, ড্রাইভার, গোয়ালা সকলেই বিহারী — এটা বিহারবাসের প্রত্যক্ষ ফল — এই সব চরিত্র রূপায়ণ প্রায় সর্বত্রই সঠিক দেখা যায়। বিহারে তখনো ইংরাজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠে নি। তাই নিম্নবিত্ত বিহারীদের সংস্পর্শেই তখন মধ্যবিত্ত বাঙালি আসতেন। তাঁদের কথাই উপন্যাসে প্রসঙ্গত লেখকেরা বর্ণনা করেছেন। বাস্তব-অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই উক্ত চরিত্রগুলো সজীব। অনুরূপা দেবীর উপন্যাস সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য কিন্তু মূল বিষয় বা চরিত্র কোনটিতেই বিহার মুখ্য হয়ে ওঠেনি।

ভাগলপুরগোষ্ঠীর আর একজন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থল বিহারের বনজঙ্গলপূর্ণ তিরোবিয়া গ্রাম। ডাকাতির তল্লাস উপলক্ষে এই গঙ্গোপাধ্যায় অরণ্যপরিবৃত পথ, পথচারী এবং ঐ সব গ্রামবাসীদের যে পরিচয় এই গ্রন্থে রেখেছেন নিবিড় পরিচয় ব্যতিরেকে এ বর্ণনা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ———

> বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গালুডি ষ্টেশনের মাইল দশেক দক্ষিণপশ্চিমে একটি বৃহৎ শালবনের প্রান্তদেশে তিরোবিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র গন্ডগ্রাম আছে। গ্রামের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর অধিবাসীর মধ্যে ঘর পাঁচেক মুসলমান ও দুই ঘর হিন্দু গোয়ালা ভিন্ন বাকী সমস্তই কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি। চক্রধরপুরের লাক্ষা সংগ্রহ ও সিংভূমের অভ্র ও লোহার খনিতে কুলিগিরি ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্যে এরা মাঝে মাঝে যে দু-চার রকমের উপায়ান্তর অবলম্বন ক'রে থাকে তার একটি নমুনা পীরনগর থেকে ঝাড়গ্রামের পথে সন্ধ্যাহরণের দিন দেখা গেছে। ..... পুলিশের দুরভিসন্ধি অন্বেষণ থেকে মান ও মানুষকে নিরাপদে রাখবার জন্য সুদূরবাসী সহধর্মীদের সহযোগিতার প্রয়োজনও তাদের কম নয়। - ১।

উপন্যাসের নায়িকা একমাসের বেশী সময় ঐ তিরোবিয়া গ্রামের এক মুসলমান বাড়ীতে অবরুদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে সন্ধ্যাকে 'বালুডি' পাহাড়ে নিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করে রঘুগোয়ালা। বালুডিতে রাখার নিরাপত্তা সম্পর্কে সে মন্তব্য করছে

বিহারের প্রকৃতি এবং/বা মানুষের কথা তাঁদের লেখায় থাকলেও সেটা এমন স্থান অধিকার করেনি যা বর্জিত হলে উপন্যাসটির মূল বক্তব্য, ঘটনা বা গল্প পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত-যে বিহারের যে বর্ণনা আছে তা বিহার-অঞ্চল না হয়ে অন্য কোন জায়গাও হতে পারতো। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে উপন্যাসের অলংকরণের কাজ হতে পারে। ভাগলপুরগোষ্ঠীর লেখায় তাঁদের বিহার-বাসের অভিজ্ঞতা সেই ভূমিকাই পালন করেছে; যদিও তাঁরা বিহারে বহুবাস করেছেন দীর্ঘদিন — ভ্রমণ উপলক্ষে সেখানে অবস্থান করেন নি।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ বিহারের প্রবাসী বাঙালী লেখিকাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রচিত 'কলেজের মেয়ে', 'আবির্ভাব', 'বিয়ের পরে', 'দুই নারী', 'পরিবর্তন', 'মুক্তি-', উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা বা কলকাতার নিকটবর্তী বাঙলা দেশের কোন স্থান। 'অমিতার প্রেম' উপন্যাসে এক জায়গায় (পৃঃ ৩) বলা হয়েছে, অমিতার বাবা ভবানীবাবু পশ্চিমে থেকে ডাক্তারি করে প্রচুর উপার্জন করেছেন— অমিতাও পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত পশ্চিমে মানুষ। সে কারণে কলকাতার মেয়েদের মতো মনে মুখে আলাদা নয়। বিহার বিষয়ক স্পষ্ট কিছুর উল্লেখ নেই।

'জীবনধারা' উপন্যাস সুরু হয়েছে এইভাবে —

> চন্দ্রনাথবাবু বেহারের একজন প্রসিদ্ধ উকিল। গঙ্গার ধারে প্রায় সিকি মাইল জুড়িয়া ফুল্বাগান, টেনিসক্ষেত্র, সবজীবাগ, বুকুর, ঝর্ণা ইত্যাদি সমেত তাঁহার প্রকান্ড অট্টালিকাখানা দর্শকের মনে একাধারে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। ..... অতি দরিদ্র মেধাবী ছাত্র হিসাবে পশ্চিমের এই সহরে জীবন সুরু করিয়া আজ তিনি সহরের একজন সেরা নাগরিক। তাঁহার দুইখানা ব্রুহাম, তিনখানা মোটর, একটা পাল্কী-গাড়ি, চারখানা একা। - ১২।

নায়িকা 'এষা'র অভিমত হিন্দুস্থানী গানেও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া সম্ভব — এ গান 'দুর্বোধ্য' বা 'কালোয়াতি' (পৃঃ ২৭) বলে যে অখ্যাতি আছে, তা

অমূলক ।

আগালতা সিংহের জীবনের অনেকখানি বিহারের কেটেছে । কিন্তু কলকাতার নাগরিক জীবনের তুলনায় বিহারের জীবন তাঁর কাছে কখনও বড় হয়ে ওঠেনি বলে মনে হয় । শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতাই তাঁর সাহিত্যে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে । দারোয়ান, চাকর চরিত্র বিহারী হলেও বিহারের সমাজ, সংস্কৃতি, প্রকৃতি কিছুই তাঁর সাহিত্যে স্থান লাভ করেনি ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে । তাঁর 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাসে প্রিন্সিপাল বিনয়কৃষ্ণ বাবুর প্রতি বেহারের আদিম এবং ন্যায্য অধিবাসীগণের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন । বাঙালী এবং বিহারীদের মধ্যে অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল - মাঝে মাঝে এই মানসিকতা কিছু তীব্র হয়েও ওঠে । বনফুলের লেখায়ও এই চিত্র আমরা দেখতে পাব । তিনি অবশ্য সেক্ষেত্রে বাঙালীদেরই দায়ী করেছেন অপ্রত্যক্ষভাবে । তার এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় পুরোপুরি অমূলক নয় । 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাসে বিনয়কৃষ্ণবাবু এবং তাঁর কন্যা সুহাসিনীর বেড়ানো উপলক্ষে মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানের কথা উল্লেখ করে সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ার কথা লিখেছেন (পৃ: ২৮) । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিন্দের বন্দী', 'রিমঝিম', 'ছায়াপথিক', 'বহুযুগের ওপার হতে', 'রাজদ্রোহী', 'দাদারকীর্তি', 'চিড়িয়াখানা', 'মনচোরা', 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে', 'শজারুর কাঁটা', —— উপন্যাসগুলোর বিষয়বস্তু এবং কুশীলব বিহারবিষয়ক নয় । তাঁর রচিত 'আদিম রিপু' উপন্যাসে পাটনার উল্লেখ বার কয়েক আছে এবং পাটনার কথা আছে দু-এক জায়গায় । 'শৈলভবন' গ্রন্থে বিহারের সমাজ, মানুষ এবং প্রকৃতি বেশ একটা বড় স্থান অধিকার করেছে, কিন্তু 'শৈলভবন'কে উপন্যাস না বলে 'বড় গল্প' বলা হয়েছে ।

মানিক ভট্টাচার্য্য বিহারের বাঙালী । তাঁর লিখিত উপন্যাসগুলো যথাক্রমে — 'প্রশান্ত', 'চির অপরাধী', 'স্মৃতির মূল্য', 'অর্পণা', 'অশ্রুনির্ঝর', 'অদৃষ্টের খেলা', কালো বৌ ইত্যাদি । তন্মধ্যে 'স্মৃতির মূল্য' পাঠ করলে ন্যূনতম ধারণা জন্মে যে ঔপন্যাসিক বিহারে বাস করেছেন । যেমন পুস্তকটি ১৩৪০

বঙ্গাব্দে আরঙ্গাবাদ (গয়া) থেকে প্রকাশিত। হাজারিবাগের কথা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। হাজারিবাগে পৌষমাসে বাঙলাদেশের তুলনায় শীত অনেক বেশী। চারিদিকে কাছে-দূরে ছোট পাহাড়। স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং নিরিবিলি জায়গা (পৃঃ ১৩৭-১৩১)। গয়ার পাণ্ডাদের কথাও আছে অল্প (পৃঃ ৮৫)। প্রবাসী সাহিত্যিকদের রচনায় পাণ্ডাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নন্দকিশোর' চরিত্রটির মধ্যে এই সহানুভূতি তিনি উজার করে দিয়েছেন (যথাস্থানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে)। বিহারে বসবাসকারী বাঙালীরা পাণ্ডাদের আচরণের মধ্যে তাদের ব্যবসাবুদ্ধির অপেক্ষা আন্তরিকতা এবং বিদেশে তাঁদের সহায়তা সঠিক উপলব্ধি করেছেন। বহিরাগত তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারী কেহই পাণ্ডাদের বিশেষ সুখ্যাতি করেন না। প্রবাসে দীর্ঘকাল পরস্পর একত্রে বাস করে স্থানীয় মানুষদের প্রবাসীরা ঠিকভাবে জেনেছেন, চিনেছেন। ফলে পাণ্ডা হলেও তারা যে মানুষ এবং জীবিকার ঊর্ধ্বে তারা যে সাহায্যও করছে, এ অনুভূতি প্রবাসীদের হয়েছে। এই ভিন্নতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত। মূল কথায় ফিরে আসা যাক- মানিক ভট্টাচার্য্যের উপন্যাসেও 'বিহার' বিন্দুমাত্র প্রাধান্য লাভ করেনি।

উপরোক্ত আলোচনার শেষে আমি আর একটি তালিকা দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করবো। আগের সারণী থেকে কোন্ কোন্ লেখককে আলোচনার অন্তর্গত করবো না সেটা যুক্তি-সহ বলা হল। এবার কার সারণীটি সেইসব ঔপন্যাসিকদের যাঁদের উপন্যাসে মুখ্য পটভূমি বিহার —— কোথাও প্রকৃতি, কোথাও মানুষ। এঁদের সাহিত্যকৃতির পটভূমি আলোচনাই আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে বক্তব্যমান ঔপন্যাসিকদের নাম কালানুক্রমে লিপিবদ্ধ হল :-

১। শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১ - ১৯৪০)
   ১ম উপন্যাস - পর্ব্বতবাসিনী
২। শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩ - ১৯৪১)
   ১ম উপন্যাস - শেষখেয়া
৩। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ - ১৯৩২)
   ১ম উপন্যাস - রমাসুন্দরী

৪। শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৯৫০)

১ম উপন্যাস - পথের পাঁচালী

৫। শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৯৮৭)

১ম উপন্যাস - নীলাঙ্গুরীয়

৬। শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯১ - ১৯৭৯)

১ম উপন্যাস - তৃণখণ্ড

৭। শ্রী সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬ - ১৯৬৫)

১ম উপন্যাস - জাগরী

৮। শ্রী সুবোধ ঘোষ (১৯০৬ - ১৯৮০)

১ম উপন্যাস - তিলাঞ্জলি

৯। শ্রী বিমল কর (১৯২১ -)

১ম উপন্যাস - ঝড় ও শিশির —

পরে যার নাম হয় — বনভূমি

পরবর্তী অধ্যায়ে বিহারপ্রবাসী এই বাঙালী ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যে বিহারের ভূপ্রকৃতি, নৈসর্গিক পরিবেশ ও উপন্যাসে উল্লিখিত স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। দেখানো হবে বিহারের জীবন ও নিসর্গ কিভাবে এইসব ঔপন্যাসিকের কিছু রচনাকে প্রাণিত করেছিল। বিহারের পটভূমি এইসব উপন্যাসের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেই পটভূমি বাদ দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসগুলি বিবেচনা করাই চলে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উল্লেখপঞ্জি

১। 'সাধের বৌ' - পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় - - উৎসর্গ

২। ঐ ঐ - মুখবন্ধ

৩। 'শান্তি-কানন' শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পৃ: ১৪

৪। ঐ ঐ ঐ

৫। ঐ ঐ পৃ: ১৪০

৬। ঐ ঐ পৃ: ১৫৪

৭। 'আশা' বিভূতিভট্টের গ্রন্থাবলী পৃ: ১১১
১ম খণ্ড
শ্রী বিভূতি ভূষণ ভট্টপ্রণীত
বসুমতী সাহিত্যমন্দির
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী
ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

৮। ঐ ঐ পৃ: ঐ

৯। 'অভিজ্ঞান' উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ: ২১
রচনাসমগ্র - উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১)
সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

১০। ঐ ঐ পৃ: ২২

১১। 'অস্তরাগ' উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ: ১৭

১২। 'জীবনধারা' আশালতা সিংহ পৃ: ১